

দ্যা রোড টু
অপারেশন আল আকসা ফ্লাড

মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা

সূচিপত্র

জায়েনিজম, নাকবা ও এথনিক ক্লিনজিং : গাজা স্ট্রিপের রক্তাক্ত অভ্যুদয়	
প্রাচীন গাজা থেকে গাজাত্ত হাশিম	১২
খ্রিষ্টান জায়েনিজম থেকে ইহুদি জায়েনিজম	১৬
ফিলিস্তিনের এথনিক ক্লিনজিং	২২
গাজা স্ট্রিপের অভ্যুদয়	২৭
প্রতিরোধের সূচনা : ব্রাদারহুডের পতন থেকে ফাতাহ'র উত্থান	
ফিলিস্তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান-পতন	৩১
নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ	৩৫
ফাতাহ ও পিএলওর দ্বন্দ্বময় অভ্যুদয়	৩৭
ইজরাইলে ধর্মীয় জায়নবাদীদের উত্থান	৪১
ছয় দিনের যুদ্ধ এবং নাসের যুগের অবসান	৪৪
প্রাথমিক প্রতিরোধ : পিএলওর দুই দশকের উত্থান-পতন	
কারামার গৌরবময় যুদ্ধ	৪৭
র‍্যাক সেক্টেম্বর ট্র্যাজেডি	৫০
ইওম কিপুর যুদ্ধ	৫৪
বিপ্লবী বন্দুক বনাম জয়তুনের ডাল	৫৬
লেবাননের গৃহযুদ্ধ	৫৮
প্রথম ইন্তিফাদা এবং হামাসের উত্থানের প্রেক্ষাপট	৬২
রেজিস্ট্রেশনের ব্যানারের হাতবদল : পিএলও থেকে হামাস	
মুসলিম ব্রাদারহুডের পুনর্জাগরণ	৬৯
হামাসের আত্মপ্রকাশ	৭২
হামাসের সনদ বনাম পিএলওর শান্তিযাত্রা	৭৭
মাদ্রিদ শান্তি সম্মেলন	৮০
অসলো শান্তি প্রক্রিয়া	৮৩

হামাসের রাজনীতি : প্রতিরোধ থেকে প্রতিনিধিত্ব

হামাসের সশস্ত্র সংগ্রাম	৮৭
অসলো টু অ্যাকর্ড	৯০
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বন্দ্ব	৯২
হুদনার প্রস্তাব	৯৪
ক্যাম্প ডেভিড টু	৯৭
দ্বিতীয় ইন্তিফাদা	৯৯
নির্বাচনের পথে	১০৪
মাহমুদ আব্বাসের উত্থান	১০৫
হামাসের নির্বাচনী চমক	১০৮

অবরুদ্ধ হামাস : পিএলওর পরিণতির পথে

অবরোধের শুরু	১১১
অপারেশন রেজিম চেঞ্জ	১১৪
উন্মুক্ত কারাগার	১২১
অপারেশন সামার রেইনস	১২৩
অপারেশন কাস্ট লিড	১২৬
অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স	১২৯
অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ	১৩২
সহিংস স্থিতিবস্থা	১৩৫

সিনওয়ারের রাজনীতি : শিকল ভাঙার শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা

ইয়াহইয়া সিনওয়ারের উত্থান	১৩৯
হামাসের নতুন সনদ	১৪৪
দ্য গ্রেট মার্চ অব রিটার্ন	১৫২

গাজা থেকে জেরুজালেম : ট্রাম্পের ধ্বংসাত্মক নীতির প্রভাব

রাজধানী জেরুজালেম	১৫৮
ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি	১৬৪
আবরাহাম অ্যাকর্ডস	১৬৮
অপারেশন সাইফ আল কুদস	১৭৪

ইহুদি উত্থাপনকারী বিস্তার : থার্ড টেম্পলের পথে

উগ্র ডানপন্থীদের পুনরুত্থান	১৮৫
-----------------------------	-----

টার্গেট আল আকসা মসজিদ	১৯২
মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু	১৯৯
দাস বিদ্রোহ : অপারেশন আল আকসা ফ্লাড	
অপারেশন আল আকসা ফ্লাড	২০৫
সাফল্যের নেপথ্যে	২১১
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ	২১৬
অনন্ত রেজিস্ট্র্যাস	২২২

জায়েনিজম, নাকবা ও এথনিক ক্লিনজিং :
গাজা স্ট্রিপের রক্তাক্ত অভ্যুদয়

প্রাচীন গাজা থেকে গাজাতু হাশিম

মিশরের রাফাহ বর্ডার ক্রসিং থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে সামান্য একটু উত্তরে বাঁক নিয়ে সোজা ইজরাইলের এরেজ ক্রসিং (Erez Crossing) পর্যন্ত এগিয়ে গেছে মাঝারি আকারের একটা পিচঢালা সড়ক। উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সম্পূর্ণ গাজা ভূখণ্ডের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া এই সড়কটার নাম তারিক সালাহউদ্দিন (طريق صلاح الدين) তথা সালাহউদ্দিন রোড। দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই; কিন্তু এই সড়কটা হচ্ছে বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর মধ্যে একটা। গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর অবস্থান দুই মহাদেশের সংযোগস্থলে। গত চার হাজার বছরের অধিকাংশ সময়জুড়ে সড়কটা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে আফ্রিকার সাথে এশিয়ার প্রধান বাণিজ্যিক ও সামরিক যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে।^১

কোনো ভূখণ্ডের ভাগ্য কীরকম হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে সেই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর। আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে উত্তর-পূর্বে এবং এশিয়া মহাদেশের একেবারে পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই গাজা ছিল ভূরাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীলনদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা মিশরীয় সভ্যতার সাথে ইরাক ও শাম অঞ্চলের সভ্যতাগুলোর যে হাজার বছরের সংঘর্ষ, তাতে গাজার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখাটা ছিল উভয় পক্ষের জন্যই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত জরুরি।^২

হাজার বছর ধরে আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলো গাজাকে ব্যবহার করে এসেছে দাবার ঘুঁটি হিসেবে, প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণের সময় সম্মুখ ঘাঁটি হিসেবে কিংবা প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করার সময় নিজেদের সাম্রাজ্যের সর্বশেষ রক্ষাকবচ হিসেবে। গত চার হাজার বছরে গাজার মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে অসংখ্যবার। বিভিন্ন সময় গাজা নিয়ন্ত্রণ করেছে মিশরীয়রা, পলেস্টীয়রা, অ্যাসিরীয়রা, ব্যাবিলনীয়রা, পারসিকরা, গ্রিকরা, রোমানরা, বাইজেন্টাইনরা, আরবরা, অটোমান তুর্কিরা এবং সবশেষে ব্রিটিশ দখলদারত্বের পূর্বে আবারও আরব মুসলমান ফিলিস্তিনিরা।

ফারাওদের শাসনামলে অন্তত ষোলোজন ফারাও বিভিন্ন সময় গাজায় বসবাস করেছেন।^৩ সালাহউদ্দিন রোড বা তৎকালীন Via Maris ব্যবহার করে বিভিন্ন সময় গাজা জয় করেছেন ফেরাউন হিসেবে খ্যাত মিশরীয় ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস, ব্যাবিলনীয় সম্রাট দ্বিতীয় নেবুচাদনেজার, পারস্যের সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট, মেসিডোনিয়ার শাসনকর্তা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, প্রখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস, কুর্দি বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, মঙ্গোলীয় শাসনকর্তা হালাকু খান, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রমুখ। সুলতান সালাহউদ্দিনের

সম্মানেই পরবর্তী সময়ে এই Via Maris-এর ফিলিস্তিনি অংশের নামকরণ করা হয় সালাহউদ্দিন রোড।

যুদ্ধ, অবরোধ কিংবা গণহত্যা গাজাবাসীর ভাগ্যে নতুন কিছু না। হাজার বছরের ইতিহাসে আক্রমণকারী বিভিন্ন বাহিনীর অভিযানে গাজা ধ্বংস হয়েছে অসংখ্যবার। এর অধিবাসীদের বাড়িঘর ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয়েছে আশেপাশের জনপদগুলোতে। কিন্তু এরপর যুদ্ধ শেষে আবারও তারা ফিরে এসেছে নিজ নিজ ভিটেমাটিতে। ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গাজাকে পরিণত করেছে সমৃদ্ধশালী নগরীতে।

এ রকম একটা বড়ো আকারের হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে; আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বাহিনীর হাতে।^৪ সে সময় আলেকজান্ডারের বাহিনী ১০০ দিন পর্যন্ত গাজা অবরোধ করে রাখে। যুদ্ধে গাজাবাসীর আক্রমণে আলেকজান্ডার আহত হলে তার বাহিনী প্রতিশোধের উন্মত্ততা নিয়ে গাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাজার প্রতিটা সন্দেহভাজন পুরুষ যোদ্ধাকে হত্যা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। গাজা থেকে ছয় জাহাজভর্তি ধনসম্পত্তি লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় মিসিডোনিয়ায়।

আলেকজান্ডারের এই গাজা অভিযান আরও দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, এই যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো গাজার মাটির নিচে টানেল তথা সুড়ঙ্গ খননের ইতিহাস জানতে পারা যায়। গাজার নরম মাটি টানেল তৈরি করার জন্য উপযুক্ত হওয়ায় এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই টানেল তৈরি করে সেখান থেকে একে অপরের ওপর আক্রমণ করে। আর দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো স্থানীয় গাজাবাসীর পাশাপাশি গাজার প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে আরব ভাড়াটে সৈন্যরা।^৫

গাজার সাথে আরবদের সম্পর্ক অনেক পুরাতন। কারণ, গাজা শুধু সামরিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; একই সাথে ছিল আফ্রিকার সাথে মধ্যপ্রাচ্যের এবং আরব উপদ্বীপের সাথে ইউরোপের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল থেকেই ইয়েমেনের বণিকরা মসলা ও মূল্যবান পাথর বিক্রি করার জন্য গাজায় যাতায়াত করত।^৬ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর টলেমির শাসনামলে নতুন করে সমৃদ্ধি লাভ করা গাজার সমুদ্র বন্দর পরিণত হয়েছিল ইয়েমেন, পেত্রা এবং আরব উপদ্বীপের বণিকদের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক গন্তব্যে। তখন গাজার সমুদ্রবন্দর পরিণত হয় ইয়েমেন, পেত্রা ও আরব উপদ্বীপের বণিকদের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক গন্তব্যে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে আরব উপদ্বীপ থেকে গাজা হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত আসা যাওয়া করা বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাফেলাটা ছিল মক্কার কুরাইশ গোত্রের নেতা হাশিম ইবনে আবদে মানাফের। এই হাশিমই মক্কার প্রধান ধর্মীয় উপাসনালয় কাবাঘরে হজ পালন করতে যাওয়া অতিথিদের আপ্যায়ন করার উদ্দেশ্যে বছরে দুটি বাণিজ্যিক কাফেলার প্রচলন করেছিলেন। একটা ছিল ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা শীতকালীন কাফেলা। আর অন্যটা ছিল গাজা হয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গ্রীষ্মকালীন কাফেলা। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—**رَحْلَةُ الشَّيْءِ وَالصَّيْفِ** অর্থাৎ ‘শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফর।’

আনুমানিক ৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এ রকম একটা সফর থেকে ফেরার পথেই হাশিম ইবনে আবদে মানাফ গাজায় মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় তার মৃত্যুর স্থানটা খুব একটা গুরুত্ব না পেলেও পরবর্তী সময়ে

সেটা মুসলমানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, এই হাশিম ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রপিতামহ। ইসলামি সাহিত্যে গাজার পরিচয় তাই শুধু গাজা হিসেবে না; বরং গাজ্জাতু হাশিম (غزة هاشم) তথা হাশিমের গাজা হিসেবে।^৭

এর আগে হাজার বছর ধরে গাজার অধিবাসীরা ছিল প্রধানত ইহুদি ও পৌত্তলিক। কিন্তু ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের প্রাক্কালে, বাইজেন্টাইন শাসনামলে গাজার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। মূলত ৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টিন খ্রিষ্টধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে মর্যাদা দিলে তখন থেকেই গাজাসহ রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকাগুলোর অধিবাসীরা খ্রিষ্টান হয়ে উঠতে শুরু করে।^৮

সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে পারস্য সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করে। সে সময় গাজার নিয়ন্ত্রণ একবার পারস্যের সম্রাট খসরুর এবং আরেকবার বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের হাতে হস্তান্তরিত হতে থাকে। ঠিক এমন সময় আরবের মরুর বুকে নতুন একটা ধর্ম বিস্তার লাভ করতে শুরু করে—ইসলাম। আর এর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই, খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম সেনাবাহিনী গাজা জয় করে নেয়।

গাজার অধিবাসীদের বড়ো একটা অংশ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বেচ্ছায় নতুন এই ধর্মটা গ্রহণ করে নেয়।^৯ পরবর্তী প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে খুব অল্প কিছু সময়ের ব্যতিক্রম ছাড়া গাজা মুসলমানদেরই বিভিন্ন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকে। বর্তমানে আমরা যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবি ভাষাভাষী গাজাকে চিনি, সেটা মূলত এরই ধারাবাহিকতা।

খ্রিষ্টান জায়োনিজম থেকে ইহুদি জায়োনিজম

গত হাজার বছরে গাজার সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে হাজারবার। কিন্তু বর্তমানে গাজা ভূখণ্ড বলতে যে এলাকাটাকে আমরা চিনি, আরবিতে যাকে কেতাআ গাজ্জা (قطاع غزة) এবং ইংরেজিতে Gaza Strip বলা হয়। তার অভ্যুদয় মাত্র ১৯৪৮ সালে। এর আগে গাজা স্ট্রিপ নামে কোনো ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না। এর আগে ব্রিটিশ শাসনামলে যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে গাজা সাব ডিসট্রিক্ট। তারও আগে অটোমান শাসনামলে ছিল গাজা সানজাক তথা গাজা ডিসট্রিক্ট এবং পরবর্তী সময়ে গাজা পাশালিক তথা গাজা প্রভিন্স। এই গাজা পাশালিক ছিল উত্তরে দখলিকৃত ফিলিস্তিনের রামলা ও জাফা শহর থেকে শুরু করে দক্ষিণে মিশরের আল আরিশ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকা।^{১০}

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পরাজিত করে ব্রিটিশরা প্রথমে গাজা এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। অতীতের শত শত আক্রমণকারী বাহিনীর মতো ব্রিটিশ বাহিনীও জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয় গাজার সালাহউদ্দিন রোডের ওপর দিয়ে। জেরুজালেমের পতন হয় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরের ১১ তারিখে। কিন্তু তারও আগে, নভেম্বরের ৯ তারিখে গাজার পতনের মধ্য দিয়েই মূলত ফিলিস্তিনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

১৯১৭ সালের ৯ নভেম্বর, ব্রিটিশ জেনারেল এডমান্ড অ্যালেনবি যেদিন গাজায় প্রবেশ করেন, ঠিক সেদিনই ফিলিস্তিনীদের ভাগ্য নির্ধারণকারী আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেদিন ব্রিটেনের লন্ডন টাইমস পত্রিকা কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) জনসমক্ষে প্রকাশ করে।^{১১} এর এক সপ্তাহ আগে, নভেম্বরের ২ তারিখে স্বাক্ষরিত ওই ঘোষণাপত্রেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোর ব্রিটেনের ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা লর্ড ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের জন্য একটা জাতীয় আবাসভূমি (National Home) গড়ে তোলার ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।^{১২}

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের ফিলিস্তিনে নিয়ে একটা রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিত করার এই ধারণাটাকে জেরুজালেমের জায়ন পর্বতের নামানুসারে জায়োনিজম তথা জায়নবাদ নামে অভিহিত করা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে প্রধানত রাজনৈতিক কারণে ইহুদিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলেও বাস্তবে ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র গঠন করার এই ধারণাটা কিন্তু শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে; ইউরোপের ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের (Evangelical Christians) হাত ধরে।^{১৩}

সে সময় খ্রিষ্টধর্মের সংস্কার আন্দোলন তথা Reformation-এর ধারাবাহিকতায় ইউরোপের প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে একটা বিশ্বাস জোরালো হতে শুরু করে। সেটা হচ্ছে, ইহুদিরা যখন জেরুজালেমের জায়ন নামক স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে, তখনই তাদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টে দেওয়া ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। এবং ওই শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবল পৃথিবীতে যিশুখ্রিষ্টের তথা মসিহের (Messiah) পুনরাগমন ঘটবে।

সে সময় ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যিশুখ্রিষ্টের এই পুনরাগমনকে ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ, তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে, তাদের জীবদশায়ই যদি ইহুদিদের ফিলিস্তিনে নিয়ে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে যিশুর পুনরাগমন ঘটানো সম্ভব হয়, তাহলে অন্তিম সময়ে যে মহাযুদ্ধ ও দুর্দশা শুরু হবে, তার আগেই যিশু তাদের কোনো রকম হিসাব ছাড়া সরাসরি স্বর্গে নিয়ে যাবেন।^{১৪}

গত কয়েক হাজার বছর ধরে ইহুদিদের পরিচয় ছিল প্রধানত একটা ধর্মের অনুসারী হিসেবে। কিন্তু ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানরা, পরবর্তী সময়ে যাদের একটা বড়ো অংশ খ্রিষ্টান জায়নবাদী (Christian Zionist) হিসেবে আবির্ভূত হয়, তারাই সর্বপ্রথম ইহুদিদের একটা জাতি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটা আবাসভূমি তৈরি করে দেওয়ার ব্যাপারে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর পেছনে অবশ্য ইহুদিদের প্রতি তাদের বিশেষ কোনো অনুরাগ বা ভালোবাসা ছিল না; বরং ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উলটো। ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি ইহুদিদের ফিলিস্তিনে নিয়ে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার পেছনে ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের আরও দুটি স্বার্থ ছিল।^{১৫}

প্রথমত, ইউরোপের খ্রিষ্টানরা কখনোই ইহুদিদের নিজেদের মাঝে আপন করে নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল কটুর ইহুদিবিদ্বেষী। যিশুখ্রিষ্টের হত্যাকারী হিসেবে সব সময়ই তারা ইহুদিদের ঘৃণা করত। এ ছাড়াও ইহুদিরা সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কারণেও সমাজের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনেক সমস্যার জন্য তাদের দায়ী করা হতো।^{১৬} ফলে তাদের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিন ছিল সম্ভাব্য একটা পরিত্যক্ত স্থান, যেখানে ধর্মীয় অজুহাতে এই ইহুদিদের নির্বাসনে পাঠিয়ে তাদের প্রভাব ও সংস্পর্শ থেকে নিজেদের সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, এই ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের অনেকেই ছিল আমেরিকা ও ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদগুলোতে আসীন। ফলে এই দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বার্থও তাদের বিবেচনায় ছিল। সে সময় বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত অটোমান সাম্রাজ্য ছিল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অন্যতম প্রধান বাধা। ফলে এই ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা ছিল এ রকম—ধর্মীয় অজুহাতে যদি ইহুদিদের ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যের একটা অংশের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে এর ফলে তাদের সাম্রাজ্যবাদেরই উপকার হবে।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের এই জায়োনিজম প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখেনি। অনেক চেষ্টা করেও ইহুদিদের তারা ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে রাজি করাতে পারেনি। কারণ, ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অনেকটাই ভিন্ন। ইহুদিদের প্রথাগত যে ধর্মীয় বিশ্বাস, যেটাকে ট্রেডিশনাল অর্থোডক্স জুডাইজম (Traditional

Orthodox Judaism) বলা হয়, তাতে যিশুখ্রিষ্টের পুনরাগমন কিংবা সেটার পূর্বশর্ত হিসেবে জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের কোনো ধারণা নেই; বরং অন্তিম সময়সংক্রান্ত তাদের ধারণা খ্রিষ্টানদের ধারণার পুরোপুরি বিপরীত।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের ইহুদির বিশ্বাস ছিল মোটামুটি এ রকম—তারা যে যেখানে আছে, সেখানে থেকেই তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন, ধার্মিক জীবনযাপন ও ধর্মীয় গবেষণা করে যেতে হবে। এরপর কোনো একদিন ঈশ্বর যখন দাউদ (আ.)-এর কোনো এক উত্তরসূরিকে মসিহ হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন, সেই মসিহ তখন জেরুজালেমে গিয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি সেখানকার হারাম আল শরিফ (الشریف الحرم) তথা টেম্পল মাউন্টে ইহুদিদের জন্য তাদের তৃতীয় উপাসনালয় (Third Temple) নির্মাণ করবেন। এরপর তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাসিত অবস্থায় থাকা ইহুদিদের জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ করে দেবেন।^{১৭} অর্থাৎ ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মসিহের আগমন ঘটানোর জন্য তাদের জেরুজালেমে যেতে হবে না; বরং মসিহের আগমন ঘটার পরেই তারা জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু ইহুদি চিন্তক প্রথমবারের মতো জায়োনিজমের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। কিন্তু প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসের কারণে সে সময় প্রায় সব ধরনের ইহুদি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিত তথা রাবাইরা (Rabbi) তাদের অনুসারীদের জায়োনিজমের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেন। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে মসিহের আগমনের পূর্বেই জেরুজালেমে গিয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ছিল জোর করে অন্তিম সময়কে টেনে আনার প্রচেষ্টার শামিল।^{১৮} ফলে শুধু ধার্মিক বা অর্থোডক্স ইহুদিরা না; ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অধিকাংশ সংস্কারবাদী (Reformist) ইহুদিও জায়োনিজমের ধারণাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে।^{১৯}

কিন্তু পরিস্থিতি পালটে যেতে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে—পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে ক্রমবর্ধমান ইহুদিবিদ্বেষ এবং ইহুদিদের ওপর পরিচালিত গণহত্যাগুলোর প্রতিক্রিয়া হিসেবে।^{২০} বিশেষ করে ১৮৮১ সালে রাশিয়াতে যখন ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়, তার প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তী দশকে ইহুদি জায়োনিজম (Jewish Zionism) আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ১৮৯৬ সালে ভিয়েনার ইহুদি সাংবাদিক থিওডোর হার্জেল তার *Der Judenstaat* তথা *The Jewish State* গ্রন্থে যুক্তি তুলে ধরেন—ইউরোপের প্রবল ইহুদিবিদ্বেষের হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইহুদিদের জন্য পৃথক একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আর এ উদ্দেশ্যেই ১৮৯৭ সালে তিনি প্রথম ওয়ার্ল্ড জায়োনিষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করেন।

ওপরে যে রকম বলা হয়েছে, ইউরোপের খ্রিষ্টানদের মধ্যে সব সময়ই একধরনের ইহুদিবিদ্বেষ ছিল। ইহুদিদের তারা নিজেদের চেয়ে ভিন্ন একটা গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করত। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করলে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের ভিন্ন একটা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে। নিজেদের মধ্যে থাকা ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন ভাষার এবং ভিন্ন ধর্মের এই জাতিকে তারা দেখতে শুরু করে সন্দেহের দৃষ্টিতে। এর প্রতিক্রিয়াতেই সে সময় প্রথমবারের মতো ইহুদিরা জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং নিজেদের

জন্য পৃথক একটা রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।^{২১} আর তখনই প্রথমবারের মতো জায়োনিজমের ধারণাটা অনেক ইহুদির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করে।

আধুনিক ইহুদি জায়োনিজমের মূল প্রবক্তাদের প্রায় কেউই ধার্মিক ছিলেন না। তাদের এই পলিটিক্যাল জায়োনিজমের আন্দোলনটা ছিল মূলত একটা সেকুলার তথা ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন। তারা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক কারণে; ধর্মীয় কারণে না। যে থিওডোর হার্জেলকে জায়োনিজমের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তিনি একটা সময়ে সম্ভাব্য ইহুদি রাষ্ট্রের স্থান হিসেবে ফিলিস্তিনের পরিবর্তে আর্জেন্টিনা ও উগান্ডার কথাও বিবেচনা করেছিলেন।^{২২}

কিন্তু হার্জেলের মৃত্যুর পর পরবর্তীকালের জায়োনিষ্ট নেতারা ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্ভাবনার বিচারে ফিলিস্তিনকেই তাদের গন্তব্য হিসেবে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজেরা ধর্মে বিশ্বাস না করলেও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তারা বাইবেলকে ব্যবহার করতে শুরু করেন; ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি হিসেবে প্রচার করতে শুরু করেন।^{২৩}

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জায়োনিষ্ট নেতারা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তারা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কাছে এ ব্যাপারে ধরনা দিতে শুরু করেন। বিশেষ করে সে সময় ব্রিটেন ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পরাশক্তি। তাই জায়োনিষ্ট নেতারা ব্রিটেনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি জোর দেন। হার্জেলের মৃত্যুর পর জায়োনিষ্ট কংগ্রেসের নেতা হিসেবে নির্বাচিত চাইম ওয়াইজম্যান এ উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে একটা শক্তিশালী প্রো-জায়োনিষ্ট লবি গড়ে তোলেন।

এই লবির সদস্যদের মধ্যে প্রধানত তিন শ্রেণির মানুষ ছিল।^{২৪} প্রথম শ্রেণিতে ছিল এমন সব ধার্মিক খ্রিষ্টান, যারা যিশুখ্রিষ্টের পুনরাগমন ঘটানোর জন্য ইহুদিদের ফিলিস্তিনে পাঠাতে আগ্রহী ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল এমন সব ইহুদিবিদ্বেষী, যারা ছিল ইহুদিদের ব্রিটেন থেকে উচ্ছেদ করতে আগ্রহী। আর তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল এমন সব অভিজাত ব্রিটিশ ইহুদি, যারা নিজেরা ফিলিস্তিনে যেতে আগ্রহী ছিল না; কিন্তু পূর্ব ইউরোপ থেকে পালিয়ে আসা দরিদ্র ইহুদিদের সেখানে পাঠিয়ে দিতে আগ্রহী ছিল।

১৯১৫ সালে গঠিত হওয়ার মাত্র দুই বছরের মাথায়, ১৯১৭ সালেই জায়োনিষ্ট লবি তাদের প্রথম সফলতার মুখ দেখে। তারা ব্রিটিশ সরকারকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয় যে, ফিলিস্তিনে একটা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই উপকারে আসবে। ব্রিটিশ সরকার এতে প্রভাবিত হয় প্রধানত এই কারণে—সে সময় মিশরের সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণে রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য অপরিহার্য ছিল। তাদের আশা ছিল, অনেকগুলো শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রের মাঝখানে, সুয়েজ খালের কাছেই একটা মিত্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা গেলে সুয়েজ খালের ওপর প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক স্বার্থ হাসিল করা তাদের জন্য সহজ হবে।^{২৫}

কাজেই সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ছিল এ রকম—ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের জন্য একটা ইহুদি রাষ্ট্র প্রয়োজন ছিল অন্তিম সময়কে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে। ইহুদি নেতাদের জন্য একটা ইহুদি রাষ্ট্র প্রয়োজন ছিল পূর্ব ইউরোপের নির্যাতিত ইহুদিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে। আর

ব্রিটিশদের জন্য একটা ইহুদি রাষ্ট্র প্রয়োজন ছিল নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এরা সবাই মিলে ঐকমত্যে পৌঁছে—ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদিদের জন্য একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই তাদের প্রত্যেকের স্বার্থ বাস্তবায়ন করা সম্ভব; তাতে স্থানীয় আরব জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে যেটাই ঘটুক না কেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর কুখ্যাত সেই বেলফোর ডিক্লারেশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের ফিলিস্তিনের বুকে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। অথচ বাস্তবে তখন পর্যন্ত ফিলিস্তিন ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ। আর তখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ ছিল ইহুদি,^{২৬} যার অর্ধেকই ছিল ১৮৮১ সালের পর থেকে রাশিয়া ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র থেকে এসে বসতি স্থাপন করা সেটলার (Settler) ইহুদি।^{২৭}

ফিলিস্তিনের এথনিক ক্লিনজিং

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর লীগ অব নেশনস তথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ফিলিস্তিন শাসনের ভার ব্রিটেনের ওপর ন্যস্ত করে। এটা ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অব প্যাเลสটাইন বা ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ অনুশাসন নামে পরিচিতি পায়। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ব্রিটিশরা এই ম্যান্ডেট শাসনের অধীনে একদিকে ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করা ইউরোপীয় সেটলার ইহুদিদের তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করে, আর অন্যদিকে স্থানীয় আদিবাসী ফিলিস্তিনীদের তাদের ঔপনিবেশিক প্রজা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষিত ও বঞ্চিত করে।^{২৮}

ব্রিটিশরা ইহুদিদের সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচের সমাজ, অর্থনীতি ও শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। তারা তাদের সম্পূর্ণ নিজেদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারেও পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। বিপরীতে আরবদের প্রতিটা বিষয়ের ওপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তারা। এমনকি আরবদের ওপর তারা এমন এক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়, যার সাথে আরবরা এর আগে পরিচিত ছিল না। ফলে ধীরে ধীরে আরবরা সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে।^{২৯}

সবচেয়ে বড়ো কথা, পরবর্তী কয়েক দশকে ব্রিটিশরা বিপুলসংখ্যক ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করার সুযোগ করে দেয়। তারা অটোমান ভূমি আইন সংশোধন করে বহিরাগত ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে জমি কেনা এবং সেই জমি থেকে স্থানীয়দের উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া সহজ করে দেয়। আবার এই উচ্ছেদ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ইহুদিরা যখন নিজস্ব সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে, তখন ব্রিটিশরা তাতেও সমর্থন দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সহায়তাও করে।^{৩০} বিপরীতে একই সময়ে তারা আরবদের সশস্ত্র হওয়ার এবং ব্রিটিশদের এসব নীতির বিরোধিতা করার সব ধরনের প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করে।

ব্রিটিশদের এসব নীতির ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ত্রিশের দশকের শুরুর দিকে জার্মানিতে নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় যাওয়ার পর যখন ইহুদিদের ওপর বৈষম্য ও নির্যাতন বৃদ্ধি পায়, তখন সেখানকার ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিনে গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে।^{৩১} আরবদের প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের কারণে মাঝখানে কয়েক বছর ব্রিটিশরা তাদের নীতি কিছুটা পরিবর্তন করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিদের ওপর চালানো হিটলারের গণহত্যা বা হলোকাস্ট (Holocaust) সব হিসাব-নিকাশ পালটে দেয়।^{৩২}

হলোকাস্টের পর একদিকে ইহুদিদের জন্য পৃথক একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিজয়ী পরাশক্তিগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে ইউরোপ থেকে বিপুলসংখ্যক ইহুদি নতুন করে ফিলিস্তিনে গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের শুরুতে ফিলিস্তিনে ইহুদি

জনগোষ্ঠী ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৭ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ শতাংশে।^{৩৩} এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রেজুলেশন ১৮১ তথা ইউএন পার্টিশন প্ল্যান পাশ হয়। এই রেজুলেশনের অধীনেই ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে একটা ভাগে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সে সময় জাতিসংঘ ছিল একেবারেই নতুন একটা সংগঠন। এর ৫৭ সদস্যের অধিকাংশই ছিল সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। অধিকাংশ আরব, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র তখনও স্বাধীনতাই অর্জন করেনি। যারা অর্জন করেছিল, তাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা রাষ্ট্রের ভোট নিশ্চিত করতে জায়োনিষ্ট লবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে দিয়ে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করিয়েছিল।^{৩৪} ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন জাতিসংঘ কর্তৃক পাশকৃত এই রেজুলেশনে ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রথাগত বর্ণবাদী ও ঔপনিবেশিক স্বার্থই বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল।

সে সময় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জনসংখ্যা ৩০ শতাংশে উন্নীত হলেও সমগ্র ফিলিস্তিনি ভূমির মাত্র ৫.৮ শতাংশ ছিল ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে।^{৩৫} সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্থানীয় আদিবাসী ফিলিস্তিনীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি ভূমি মাত্র কয়েক দশকে ত্রয় করা ইহুদিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ জাতিসংঘের পার্টিশন প্লানে ৫.৮% ভূমির মালিক এই ৩০% ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় সমগ্র ফিলিস্তিনের ৫৬% ভূমি। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ৭০% আদিবাসী আরবদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় মাত্র ৪২% ভূমি।^{৩৬}

এই বিভাজনের মধ্যেও প্রচুর বৈষম্য ছিল। ১৯৩৭ সালের পিল কমিশনের প্রতিবেদনের (Peel Partition Plan) ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালের পার্টিশন প্ল্যানও করা হয়েছিল মূলত ইহুদিদের চাওয়া-পাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে।^{৩৭} ফলে এই বিভাজন পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনের অধিকাংশ উর্বর ভূমি, অধিকাংশ বসবাসোপযোগী উপত্যকা এবং অধিকাংশ সমুদ্র উপকূল বরাদ্দ দেওয়া হয় ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য। সেইসাথে অধিকাংশ রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সুবিধা-সংবলিত শহুরে এলাকা এবং অধিকাংশ সমুদ্র বন্দরের অবস্থানও ছিল ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ দেওয়া অংশগুলোতে।^{৩৮}

জাতিসংঘের পার্টিশন প্ল্যান পাশের পরপরই, ১৯৪৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রশাসন নিশ্চিত করে, ১৯৪৮ সালের মে মাসের ১৫ তারিখেই ম্যান্ডেট শাসনের অবসান ঘটবে। আর এর পূর্বেই তারা ফিলিস্তিন থেকে সকল সৈন্য সরিয়ে নেবে। ওই ঘোষণার পরপরই ফিলিস্তিনজুড়ে সহিংসতা শুরু হয়ে যায়। পার্টিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করে স্থানীয় আরবরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ইহুদি দোকানপাট ও যানবাহনের ওপর আক্রমণ করে। আর বিপরীতে ইহুদি মিলিশিয়া বাহিনীগুলো প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানাজুড়ে ফিলিস্তিনি গ্রামগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে দেয় এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রায় ৭৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে বাস্তবায়িত করে।^{৩৯}

১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ ডেভিড বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে ইহুদিদের প্রধান মিলিশিয়া বাহিনী হাগানা Plan Dalet তথা প্ল্যান ডি চূড়ান্ত করে।^{৪০} এই পরিকল্পনার আওতায় পরবর্তী মাসগুলোতে ইহুদি মিলিশিয়া বাহিনীগুলো ফিলিস্তিনীদের ওপর এথনিক ক্লিনজিং (Ethnic Cleansing) তথা জাতিগত নিধন কর্মসূচি পরিচালনা করে। মে মাসের ১৫ তারিখে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে পেশাদার সৈন্যরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার আগেই মাত্র দুই মাসে তারা প্রায় ২০০ ফিলিস্তিনি গ্রাম

পুরোপুরি দখল করে নেয় এবং সেগুলো থেকে আড়াই লাখ ফিলিস্তিনিকে স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করে।^{৪১}

ইহুদিদের এসব আক্রমণ, গণহত্যা ও উচ্ছেদ কর্মসূচির সামনে ফিলিস্তিনিরা ছিল সম্পূর্ণ অসহায়। কারণ, তাদের প্রতিরোধের সক্ষমতা এর আগেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তিনিরা যখন ব্রিটিশদের ইহুদিবান্ধব নীতির বিরুদ্ধে গ্রেট রিভোল্ট (الثورة الكبرى) শুরু করেছিল, তখন সেই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশরা ২০ হাজার সৈন্য নিয়োগ করেছিল। ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে বিমান হামলা চালিয়ে এবং তাদের গণহারে বাস্তুচ্যুত করে তিন বছর পর তারা সেই বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। ততদিনে ফিলিস্তিনের পুরুষ জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশই হয় নিহত, অথবা আহত, গ্রেফতার বা দেশান্তরী হয়েছিল।^{৪২}

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করতে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে আরব লীগের কয়েক হাজার সদস্যের একটা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু ইহুদি মিলিশিয়া বাহিনীগুলোর তুলনায় এদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।^{৪৩} ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শাসনের অবসানের ঠিক আগের দিন, মে মাসের ১৪ তারিখে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সর্ববৃহৎ সংগঠন জুইশ এজেন্সি ইজরাইল নামক রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেয়। এর পরপরই আরব রাষ্ট্রগুলো প্রথমবারের মতো তাদের নিয়মিত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করে। তখন দেখা যায়, সেই সম্মিলিত সেনাবাহিনীও নবগঠিত ইজরাইল রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক দুর্বল।

এর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রই তখন সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। একমাত্র মিশর ছাড়া বাকিদের তখনও কার্যকর অর্থে সেনাবাহিনীই গড়ে ওঠেনি। মিশরীয় সেনাবাহিনীও তখন পর্যন্ত সেই অর্থে পেশাদার হয়ে উঠতে পারেনি।^{৪৪} ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করতে যাওয়া মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রায় অর্ধেকই ছিল মিশরের ইসলামপন্থি বিরোধী রাজনৈতিক দল ইখওয়ানুল মুসলিমিন (الإخوان المسلمين) তথা মুসলিম ব্রাদারহুডের স্বেচ্ছাসেবী। বলতে গেলে তাদের কোনো প্রশিক্ষণই ছিল না।^{৪৫}

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ইজরাইলি সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার। সেখানে আরব সেনাবাহিনীগুলোর সম্মিলিত সংখ্যা কখনোই ৫০ হাজারের বেশি অতিক্রম করতে পারেনি।^{৪৬} ব্রিটিশদের বিভাজন নীতি এবং জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহর স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে এই বাহিনীগুলোর মধ্যেও তেমন কোনো সমন্বয় ছিল না। এরা প্রত্যেকে যুদ্ধ করছিল বিচ্ছিন্নভাবে; ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।^{৪৭}

তার ওপর একদিকে আরবদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ছিল অপরিপূর্ণ, বিপরীতে ইজরাইলি সেনাসদস্যদের একটা বড়ো অংশ ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। সবচেয়ে বড়ো কথা, যুদ্ধের শুরুতেই ব্রিটিশ ও ফরাসিদের অবরোধের কারণে আরবদের অস্ত্র সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইজরাইলি সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে সক্ষম হয়।^{৪৮}

ফলে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে যখন এই অসম যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে, ততদিনে সমগ্র ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশ এলাকাই চলে যায় ইজরাইলের দখলে। মিশর ও জর্ডান যথাক্রমে গাজা ও পশ্চিম তীরের কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলেও বাকি অংশগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় চিরতরে। ইজরাইলি বাহিনী ৫৩১টি ফিলিস্তিনি গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যুদ্ধের শেষ নাগাদ প্রায় সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনিকে বাস্তবচ্যুত করা হয়; যে সংখ্যাটা ছিল তৎকালীন ফিলিস্তিনের স্থানীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক।^{৪৯} ফিলিস্তিনি আরব জনগোষ্ঠীর এই ভয়াবহ দুর্দশা ইতিহাসে নাকবা (النكبة) তথা মহাবিপর্ষয় নামে পরিচিতি পায়।

গাজা স্ট্রিপের অভ্যুদয়

১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ব্রিটিশরা দেশটাকে ছয়টা ডিসট্রিক্টে ভাগ করেছিল, যার মধ্যে একটা ছিল গাজা ডিসট্রিক্ট।^{৫০} এই গাজা ডিসট্রিক্টকে তারা আবার দুটি সাব ডিসট্রিক্টে ভাগ করেছিল। অপেক্ষাকৃত ছোটো, কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাটা ছিল গাজা সাব ডিসট্রিক্ট। আর অপেক্ষাকৃত বড়ো, কিন্তু জনবিরল অংশটা ছিল বিরশেবা সাব ডিসট্রিক্ট। এই গাজা সাব ডিসট্রিক্ট ছিল মিশরের সীমান্তবর্তী রাফাহ থেকে শুরু করে দখলিকৃত ফিলিস্তিনের মাজদাল আসকালান (বর্তমান আশকেলন) হয়ে আশদুদ (বর্তমান আশদোদ) পর্যন্ত বিস্তৃত।

পরবর্তী তিন দশকে ফিলিস্তিনের অন্যান্য অংশে ইউরোপ থেকে আগত ইহুদিদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেলেও গাজায় এই বৃদ্ধির হার ছিল একেবারেই কম। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে গাজা সাব ডিসট্রিক্টের ১ লাখ ৩৭ হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র দুই শতাংশ ছিল ইহুদি। আর তাদের মালিকানায় ছিল গাজার মাত্র চার শতাংশ জমি।^{৫১} ফলে ১৯৪৭ সালের পার্টিশন প্ল্যানে গাজা সাব ডিসট্রিক্টের অধিকাংশ এলাকাকে এবং সেইসাথে বিরশেবা সাব ডিসট্রিক্টের মিশরীয় সীমান্তসংলগ্ন বিশাল এলাকাকে আরব রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

জাতিসংঘের পার্টিশন প্ল্যান ঘোষণার পরদিন থেকেই ফিলিস্তিনজুড়ে যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, তার কেন্দ্রে ছিল প্রধানত জেরুজালেম, জাফা, হাইফাসহ ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো। ইহুদি মিলিশিয়াগুলো নিজেদের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকাগুলো থেকে আরবদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াটাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। বিপরীতে গাজায় মুসলিম ব্রাদারহুডের মিশরীয় ও ফিলিস্তিনি স্বেচ্ছাসেবীরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সেখানকার পরিস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে শান্ত। তারপরও ১৯৪৮ সালের মে মাস নাগাদ জাফা থেকে প্রায় দশ হাজার শরণার্থী এসে গাজায় আশ্রয় নেয়।^{৫২}

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেয়। তার পরদিনই প্রথমবারের মতো মিশরীয় সেনাবাহিনী গাজায় প্রবেশ করে। গাজার সালাহউদ্দিন রোডের ওপর দিয়ে তারা তেলআবিব পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যান্য আরব সেনাবাহিনীর মতোই মিশরীয় সেনাবাহিনীও ছিল অস্ত্রশস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে ইজরাইলি বাহিনীর তুলনায় অনেক দুর্বল। তার ওপর জর্ডানীয় বাহিনীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তারা মাঝপথে বিপাকে পড়ে যায়।^{৫৩} ফলে পার্টিশন প্ল্যানের আরব রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে যেতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

তা ছাড়া সে সময় মিশরের ক্ষমতায় ছিল পশ্চিমাপন্থি বাদশাহ ফারুকের অজনপ্রিয় সরকার। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও তখনও পর্যন্ত মিশরের রাজনীতিতে ব্রিটেনের প্রচণ্ড প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল।^{৫৪} ফলে ফিলিস্তিনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে

ব্রিটিশদের অসম্ভব করতে বা ক্ষেপিয়ে তুলতে মিশরীয় সরকার আহ্বানী ছিল না। জনগণের চাপে তারা ফিলিস্তিনে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিল অনেকটাই প্রতীকী।

মিশরীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি মুসলিম ব্রাদারহুডের স্বেচ্ছাসেবীরাও সে সময় গাজায় ইজরাইলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। কিন্তু ব্রাদারহুডের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায়, ফিলিস্তিনে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তিশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় এবং তাদের গোপন শাখার কিছু হঠকারী কর্মকাণ্ডে মিশরীয় সরকার ভীত হয়ে ওঠে। ফলে গাজায় প্রবেশ করার পরপরই মিশরীয় সেনাবাহিনী ব্রাদারহুডের স্বেচ্ছাসেবীদের নিরস্ত্রীকরণ করে।^{৫৫} ১৯৪৮ সালের শেষ নাগাদ ব্রাদারহুডের সাথে মিশরীয় সরকারের সংঘর্ষ চরম পর্যায়ে উপনীত হলে সরকার ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করে।^{৫৬}

এসব কিছুই গাজায় ইজরাইলবিরোধী যুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, ততদিনে গাজা সাব ডিসট্রিক্টের আশকেনন, আশদোদ এবং বিরশেবা সাব ডিসট্রিক্টের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ইজরাইলের দখলে চলে যায়। এককালের বিশাল গাজা প্রভিন্স পরিণত হয় মাত্র ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটারের ক্ষুদ্র এক টুকরো উপকূলীয় ভূখণ্ডে, যার নাম হয় গাজা স্ট্রিপ। যে সালাহউদ্দিন রোড এককালে বিস্তৃত ছিল কায়রো থেকে দামেশক পর্যন্ত, সেটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে। সালাহউদ্দিন রোডের মতোই গাজা পরিণত হয় এক অপরূপ ভূখণ্ডে; যার একদিকে মিশর, অন্যদিকে নবগঠিত ইজরাইল।

যুদ্ধ শুরুর আগে গাজা স্ট্রিপের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ হাজার। যুদ্ধ শেষে সেখানে এসে আশ্রয় নেয় আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে উচ্ছেদের শিকার হওয়া আরও দুই লাখ ফিলিস্তিনি।^{৫৭} অর্থাৎ গাজা স্ট্রিপের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি হয়ে ওঠে বাস্তুচ্যুত শরণার্থী। গাজা স্ট্রিপ পরিণত হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবিরে। ৭৭ বছর পর আজও বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবিরের নাম গাজা স্ট্রিপ। এর ২১ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ১৭ লাখই সেই শরণার্থীদের বংশধর।^{৫৮}

গত সাড়ে সাত দশক ধরে গাজা স্ট্রিপের এবং সেইসাথে সমগ্র ফিলিস্তিনের ইতিহাস যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, এর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে আবর্তিত হয়েছে, তার পেছনে আছে এই বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর সর্বস্ব হারানোর অপরিসীম বেদনা এবং তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ছিল এই আকাঙ্ক্ষারই প্রবল বিস্ফোরণাশ্রয় একটা প্রকাশ।